OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 804 - 811
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘ছোটোদের মহাভারত’-এ ‘বড়ো’-দের বিষয় : উপস্থাপনের কারিগরি

সম্প্রীতি বসু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sampritidbose@gmail.com
0009-0000-2789-7709

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Children’s and Young Adults’ literature, Mahabharata, Sexuality, Violence, Marriage, lower Cast, Ethics.

Abstract
The great Indian epic Mahabharata is not only a highly complex text but also an immensely vast one, comprising nearly one lakh shlokas and eighteen parvas (sections). This combination of complexity and volume often makes it intimidating for readers—especially younger audiences—to engage with or remember the epic in its entirety. Nevertheless, in Indian society, and particularly in Bengal, familiarity with the Mahabharata is considered essential from an early age. Over the centuries, various Bengali translations and adaptations—dating back to the 14th century—have made the epic more accessible. However, these traditional readings were not age-specific. When Bengali writers began incorporating the Mahabharata into children's and young adult literature, they were compelled to modify or omit many elements from the original. These included depictions of sexuality, violence, philosophical and ethical dilemmas, as well as issues of caste and class—components integral to the epic’s narrative fabric. Given that these so-called "adult" themes are central to the Mahabharata, the task of retelling the story for young readers posed a significant challenge. To preserve the essence of the epic while making it age-appropriate, writers developed unique and subjective storytelling strategies. Rather than removing these themes entirely, they often reinterpreted or reframed them in ways deemed more suitable for younger audiences. The aim of this paper is to explore how selected Bengali writers have addressed these complex elements in their retellings of the Mahabharata for children and young adults, and to examine the narrative strategies they employed to balance fidelity to the original with accessibility and appropriateness for a younger readership.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

উনিশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে একুশ শতক পর্যন্ত মহাভারতের মতো বিশালাকার মহাকাব্যকে ছোটোদের উপযুক্ত করে অর্থাৎ কাহিনি-উপকাহিনি বাদ দিয়ে 'সরল', 'সহজ' করে লেখার সময় শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা মূল সংস্কৃত *মহাভারত*-এর পূর্ণাঙ্গ আখ্যানভাগকে গ্রহণ করেননি। তার পরিবর্তে কুরু-পাণ্ডবের গল্পকেই প্রধানত বেছে নিয়েছেন। মহাভারতের এই সংক্ষিপ্তকরণ একদিক থেকে যেমন আকারগত তেমনই উপাদানগতও। আকারে ছোটো করলেও মহাভারতের গল্পের বুননে উপস্থিত গঠনগত জটিলতা, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের স্ববিরোধ ছোটোদের বোঝানোর জন্যে সংক্ষেপে বলা বেশ কঠিন কাজ হয়ে উঠেছে। *ছেলেদের মহাভারত*-এর ভূমিকায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বলেছেন, মহাভারতের আখ্যানকে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী করতে গেলে স্থানে স্থানে 'আবরণের প্রয়োজন হয়'।[১] উপেন্দ্রকিশোরের মতো সরাসরি উল্লেখ না করলেও প্রায় প্রত্যেক মহাভারত লেখকই কম-বেশি মেনে নিয়েছেন এই 'আবরণের প্রয়োজন'। আসলে ছোটোদের লেখায় আবরণের স্বরূপ বা বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয় 'ছোটো' ও 'বড়ো' বিপরীত শব্দ দু-টির আপেক্ষিক ধারণার প্রেক্ষিতে। এই প্রবন্ধে আবরণের প্রয়োজন পড়ে এমন বিষয়গুলোকে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার অন্তর্গত করে বলা হল 'বড়ো'-দের বিষয়।

তবে 'বড়ো'-দের সংজ্ঞা নির্ণয়ের আগে ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা 'ছোটো' বলতে ঠিক কাদের বুঝিয়েছেন তা দেখে নেওয়া দরকার। ছোটোদের মহাভারতের নামগুলিতে 'ছেলেদের', 'শিশু', 'শিশুরঞ্জন' বা 'শিশু অথবা সংক্ষিপ্ত' ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করা হচ্ছে এইটা বোঝাতে যে এই মহাভারতগুলোর পাঠক প্রধানত ছোটোরা। সুনির্মল বসু যেমন ছড়ায় ছোটোদের মহাভারত লেখার সময় নামপত্রে আলাদা করে উল্লেখ করছেন— 'যুক্তাক্ষর বর্জিত' শব্দদুটি। বাংলা পাঠক্রমে যুক্তাক্ষর শেখানো হয় দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অর্থাৎ ছয় বা সাত বছরের কম বয়সীদের, সুতরাং মূল মহাভারতের কাহিনি বা তার গভীরতাকে ছোঁয়া সুনির্মল বসুর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন পাঠকদের জন্যেই তিনি লিখছেন যারা যুক্তাক্ষর পাঠ করতে শেখেনি। স্বামী অমলানন্দ তাঁর *ছোটোদের মহাভারত*-এর উদ্দিষ্ট পাঠক বা টার্গেট রিডার হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের'[২], শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন তিনি বারো থেকে পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য মহাভারত লিখছেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কুরু-পাণ্ডব* বইটিও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 'উচ্চতর বর্গ'-এর[৪] পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে কবি জানাচ্ছেন। সুতরাং খগেন্দ্রনাথ মিত্র ষাট পৃষ্ঠায় হোক বা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর চার-শো পৃষ্ঠায়— এই ছোটোদের মহাভারতগুলি শিশুদের জন্যে লেখা হচ্ছে না বরং লেখা হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে। কারণ ছোটোদের বলতে প্রধানত আট থেকে নয় বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু উপরে উল্লেখিত লেখকরা বারো থেকে পনেরো বছর বয়সী বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীদের পাঠক ধরেই এই মহাভারতগুলি পরিকল্পনা করছেন।

প্রশ্ন থেকে যায়, বারো থেকে পনেরো বছর বয়সীদের জন্যে মহাভারতের গল্প বলার সময়ও যদি আবরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় 'বড়ো'-দের বিষয় মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে 'প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয়', কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত বিষয় নয়। আন্তর্জাতিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয় পনেরো থেকে একুশ বছর বয়সী নারী-পুরুষকে যেখানে আঠারো বছর বয়স সবচেয়ে সাধারণ।[৫] এই বয়সে শারীরিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে আসে আইনি স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, নিজস্ব মতামত ও চিন্তাভাবনা, যৌনতা সংক্রান্ত স্বচ্ছ ধারণা এবং বিচারবোধের গভীরতা, ফলে অনেক জটিল বিষয়ও সহজ হয়ে ধরা দেয়। বিশেষত পাঠের ক্ষেত্রে এই বোধই সহায়তা করে মহাভারতের নৈতিক টানা-পোড়েন, বিচিত্র বিবাহ পদ্ধতি, জন্মের জটিলতা, হিংসা-প্রতিহিংসা-যুদ্ধ, লিঙ্গ রূপান্তর, যৌনতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব-র মতো বিষয়গুলো বুঝতে। এই প্রবন্ধে মহাভারতের অন্তর্গত প্রাপ্তবয়স্ক বা বড়োদের বিষয়গুলো লেখকরা কীভাবে ছোটোদের পাঠ্য এবং বোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন তা বোঝার চেষ্টা করা হবে।

মহাভারত থেকে কিছু এমন ঘটনা নির্বাচন করে তাকে কয়েকটি কেন্দ্রীয় ভাবনার অন্তর্গত করে দেখা যাক ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা সেগুলিকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক। বিচিত্র জন্ম ও বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতা : বিশ শতকের প্রথমাংশে লেখা বেশিরভাগ ছোটোদের মহাভারত শুরু হচ্ছে হস্তিনাপুরে রাজা বিচিত্রবীর্যের দুই সন্তান পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম থেকে। তাছাড়াও শান্তনু-সত্যবতীর কথা দিয়েও কিছু মহাভারত লেখা হচ্ছে। মূল মহাভারত থেকে জানা যায় সত্যবতীর সঙ্গে রাজা শান্তনুর বিবাহের শর্তই ছিল প্রথম পুত্র দেবব্রতের পরিবর্তে সত্যবতীর সন্তানদের সিংহাসন প্রাপ্তি। এই শর্তের কথা জেনেই গঙ্গাপুত্র যোগ্যতম হওয়া সত্ত্বেও পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্যে রাজা না-হওয়ার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এবং সেই থেকেই তিনি পরিচিত হলেন ভীষ্ম নামে। কিন্তু সন্তানহীন অবস্থায় সত্যবতী পুত্র বিচিত্রবীর্য মারা গেলে উত্তরাধিকারের আশায় দিশাহীন সত্যবতী বিচিত্রবীর্যের বিধবা দুই স্ত্রী অম্বিকা আর অম্বালিকা গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্যে নিয়োগ করেন তার প্রথম সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস-কে। কিন্তু কী এই নিয়োগ প্রথা? প্রাচীন ভারতে কোনো দেশের রাজা সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে, তাঁর মৃত্যুর পর রাজপরিবারেরই যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করা হত যাতে বংশের সম্মান এবং রক্তের শুদ্ধতা বজায় থাকে, এই প্রথাটির নাম নিয়োগ প্রথা। বিবাহ না করার সঙ্গে ভীষ্ম আরও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পিতা না হওয়ারও। তাই ব্যাসদেব নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর জন্ম না দিলে কুরু বংশ লোপ অনিবার্য হয়ে উঠত। ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা এই জটিলতা শুরুতেই এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একবাক্যে বললেন বিচিত্রবীর্যের পুত্র হল পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র। যা একদিকে সত্যের সামান্য বিকৃতি তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন প্রথার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা। ফলে বিতর্কিত প্রসঙ্গ বাদ দিতে গিয়ে মূল তথ্য কিছুটা ভুলভাবেই পরিবেশিত হল ছোটোদের কাছে।

একইরকম ভাবে পাণ্ডব নাম হলেও পঞ্চপাণ্ডবের কেউই পাণ্ডুর পুত্র ছিলেন না। পাণ্ডু সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হওয়ায় তার দুই স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী সন্তান ধারণের জন্য কুন্তীর শেখানো ভগবানদের আহ্বান-মন্ত্র দ্বারা সন্তানসম্ভবা হন। সত্যবতীর বিবাহের পূর্বের সন্তান ব্যাসদেবকে তিনি মান্যতা দিলেও পুত্রবধূ কুন্তী কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তাঁর বিবাহপূর্ববর্তী সন্তান কর্ণকে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র-এর *ছোটোদের মহাভারত*-এ দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করছেন কর্ণের নামেও তর্পণ করতে কারণ সে তাদের বড়ো ভাই।[৬] অন্যদিকে গান্ধারী এক-শো সন্তানের জন্ম না দিয়ে লোহার পিন্ড প্রসব করেন। যার থেকে এক-শো সন্তান তৈরির পর দেখা যায় জন্মসময়ের বিচারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বংশের বড়ো হওয়ায় তিনিই সিংহাসনের অধিকারী হলেন।

জন্মগত জটিলতার সঙ্গে বিবাহসূত্রেও মহাভারতে বেশ কিছু বিতর্ক তৈরি হয়। যেমন, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর এবং পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তার বিবাহ। সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও নারীর পাঁচ জনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ এই মহাভারতীয় সময়ে হোক বা একুশ শতক, সব যুগের মানুষের কাছেও সমান অস্বস্তিকর। খগেন্দ্রনাথ মিত্র *ছোটদের মহাভারত*-এ বিষয়টা দেখালেন এইভাবে—পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরলে কুন্তী বুঝতে না পেরে বললেন যা এনেছ তা তোমাদের পাঁচ জনের থাক। মাতৃ আজ্ঞা মান্য না-করলে মহা অন্যায় হবে। তাই পাঁচ জনই মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্যে দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন। এই ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যায় যখন লেখক যোগ করেন— দ্রুপদের নিজের মেয়ের পাঁচ জনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি ভালো লাগল না বলে তাকে ব্যাসদেব বোঝালেন দ্রৌপদী শিবের বরে পাঁচ জন গুনবান পতি পেয়েছেন। ব্যাসদেবের কথা শুনে দ্রুপদ এই বিয়ে দিতে রাজি হলেন। পাঁচ জনকে পতি হিসেবে গ্রহণ করাকে এইভাবেই মান্যতা দেওয়া হল ব্যাসদেবের কথা দিয়ে।

পাঁচ জনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা দ্রৌপদীকে অপমানের একটি কারণ হয়ে ওঠে বার বার। কিন্তু অর্জুনের জীবনেও ছিল অন্য অনেক নারী তাদের কথা উহ্য রাখা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। অন্যান্য রাজপুরুষদের বিবাহ বা রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সন্তান উৎপাদন বিষয়ে ছোটোদের মহাভারত যথাসম্ভব নীরব। পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম প্রথম বিবাহ করেন হিড়িম্বাকে। রাক্ষসী হওয়ায় সে কোনো দিন প্রথম পাণ্ডব বধূর এবং ভীম আর হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ প্রথম পাণ্ডবপুত্র হিসেবে যথাযোগ্য সম্মান পায় না। সমাজ তাকে রাক্ষসী হিসেবেই দেখে, ছোটোদের মহাভারতেও হিড়িম্বার বর্ণনা দেওয়ার সময় তাই কিছুটা অশ্রদ্ধা মিশে থাকে। তার ভাষা এবং কথনভঙ্গিকে মজার করে পরিবেশন করা হয়। যেমন, লীলা মজুমদারের *বকবধ পালা*-য় নিম্নবর্গের মুখের ভাষা বা প্রান্তিক বাংলা উপভাষা-ভাষী মানুষদের মুখের ভাষাকে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মুখে বসানো হয়।[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বয়ংবর সভার পাশাপাশি মহাভারতে প্রদর্শিত ক্ষত্রিয় রাজাদের আর একটি বিবাহের পদ্ধতি হল—অপহরণ করে এনে বলপূর্বক বিবাহ। ভীষ্ম, স্বয়ং কৃষ্ণ, অর্জুন সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অর্জুন সুভদ্রা হরণের অনেক আগেই ভীষ্মও বিচিত্রবীর্যের জন্যে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-কে হরণ করে আনেন। অম্বা এই বিবাহে রাজি ছিল না কারণ সে নিজে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছিল মহারাজা শাল্বকে। বলপূর্বক অপহরণের ফলে অম্বা বিয়ে না করে শাল্বর কাছে ফিরে গেলেও শাল্ব তাকে আর বিয়ে করতে রাজি হয় না। ফলে অম্বা মনে করে ভীষ্ম তার জীবন নষ্ট হওয়ার জন্যে প্রধানত দায়ী। যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই অম্বা শিখণ্ডী হয়ে জন্মায়। ইচ্ছামৃত্যুর বর থাকা ভীষ্মকে হত্যার হাতিয়ার হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেয়। এবং শিখণ্ডী সামনে থাকলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবেন না প্রতিজ্ঞা করায় ভীষ্ম অস্ত্র ধারণ না করে অর্জুনের বাণে রথ থেকে পড়ে শরবিদ্ধ হন। যা দুর্যোধনদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরাজয়কেই অব্যর্থ করে। লক্ষণীয় ছোটোদের মহাভারতে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ভীষ্মের মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলছেন, অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে শরসজ্জায় আটান্ন দিন থাকাকালীন ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ও বাকিদের গল্পের ছলে উপদেশ দিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হল।[৮] ভীষ্মের মৃত্যুতে যে শিখণ্ডীর কোনো ভূমিকা ছিল তা এক্ষেত্রে বলাই হল না, এমনকী শিখণ্ডী চরিত্র এবং তা পরিচয় দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করলেন না খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো না জানলেও মহাভারতের গল্প জানায় ছোটোদের বাধা তৈরি হচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, ছোটোদের মহাভারতে এই ঘটনাগুলো উল্লেখের কোনো প্রয়োজন বা দায়ই কি লেখকদের নেই? মনে রাখতে হবে, জন্ম বা বিবাহসূত্রে ঘটা এই ঘটনাগুলোই প্রকৃতপক্ষে *মহাভারত*-এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে অনিবার্য করেছিল। কারণ পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাতই তো বংশের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী নির্বাচনে জন্মগত জটিলতায়। কিন্তু ছোটোদের মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের বিবাদের কেন্দ্রীয় কারণটিকে উহ্য রেখে শুধু দেখানো হল ছোটো থেকেই 'দুষ্টু' কৌরবরা হিংসা করত 'ভালো' পাণ্ডবদের। এই হিংসাই পরবর্তী কালে আরও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করল। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের অতি-সরলীকরণের ফলে কুরুক্ষেত্রের মতো বিশালাকার যুদ্ধের গোড়াটাই যুক্তি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হল না ছোটোদের মহাভারতে।

দুই। যৌনতার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত : পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত কৌরবরা পাশাখেলায় পঞ্চপাণ্ডবকে হারালে কৌরবরা দ্রৌপদীকে 'দাসী' বলে সকলের সামনে অপমান করতে লাগলেন। কিন্তু কী হয়েছিল তা যতটা সম্ভব গোপন রাখা হল। তার পরিবর্তে বলা হল—সে যে কি অপমান মুখে আনতে বাধে! দুর্যোধনরা কুৎসিতভাবে অপমান করলেন। কিন্তু বীর স্বামীরা অসহায়ের মতো চুপ করে বসে রইলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে দ্রৌপদী চরম অপমান থেকে রক্ষা পেলেন। দ্বিতীয় পাশাখেলার সময় দুঃশাসন আবার দ্রৌপদীর বেণী ধরে খুলে দিলেন। তখন দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করলেন দুঃশাসনের শাস্তি না হলে বেণী বাঁধবেন না। দ্রৌপদীর চূড়ান্ত অপমানের প্রতিহত করতে কোনো পাণ্ডব এগিয়ে আসেনি তার কারণ তারা সবাই দাস হয়ে গেছিল। কিন্তু ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরে টেনে সভায় এনেছে এবং তার কাপড় খুলে দিয়েছে "আমি এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করব, আর গদাঘাতে দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করব।"[৯]

দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে টেনে যখন দুঃশাসন বস্ত্রহীন করতে পারলেন না তখন হাল ছাড়লেন কিন্তু অপমানের কোটা তখনও পূর্ণ হয়নি তাই দুর্যোধন তাকে আরও অপমান করতে থাকলেন এবং তিনি হাসতে হাসতে দ্রৌপদীকে পা দেখাতে লাগলেন। ভীম তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রতিজ্ঞা করলেন, গদা দিয়ে দুষ্টু দুর্যোধনের ঊরু ভেঙে ফেলবেন। এবং বললেন যদি না পারি তাহলে আমার স্বর্গে যাওয়ার পথ যেন বন্ধ হয়।

'পা দেখালেন' অর্থ স্পষ্ট করে বলা হল না। ছোটো থেকে বাচ্চাদের শেখানো হয় পা দেখানো অর্থাৎ লাথি দেখানো একটা খারাপ অঙ্গভঙ্গি। গায়ে পা লাগলে বড়োদের প্রণাম করার রেওয়াজও সমাজে প্রচলিত। পা দেখানো তাই এককথায় অসম্মান করা। এই বোধ ছোটো থেকেই তৈরি হয়। ঊরুভঙ্গম এর কারণ এখানে বলা হয় পা দেখানো। কিন্তু কী অর্থে দুর্যোধন পা দেখিয়েছিলেন তা প্রায় কোনো ছোটোদের মহাভারতকারই ব্যাখ্যা করলেন না। কারণ এর মধ্যে লুকিয়ে আছে যৌনতার ইঙ্গিত।[১০] দ্রৌপদী যেহেতু দাসী হয়ে গেছিলেন তাই তাকে বাঁ পা দেখানোর অর্থ ছিল শয্যায় আহ্বান। যা দ্রৌপদীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাছে শুধু নয় পঞ্চপাণ্ডবের কাছে চরম অপমানজনক। আর এই জন্যেই ভীম যে উরু দেখিয়ে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে কুইঙ্গিত করেছিলেন সেই উরু ভেঙে তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ছোটোদের মহাভারত-এ এই প্রসঙ্গটি যতটা সম্ভব উপেক্ষা করে যাওয়া হল। অন্যদিকে কর্ণ বিশ্রী গালাগাল দিলেন এটুকুই বলা হল। কী অপমান করেছিলেন সেটাই বলা হল না। ফলে এই অপমানের মধ্যেই যে নিহিত ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতিশোধের লিপ্সা এবং নৃশংসতার বীজ তার গুরুত্ব বুঝতেও পারল না কমবয়সী পাঠকরা।

শুধু বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে নয় পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর দাম্পত্য জীবনের নিয়ম বলার ক্ষেত্রেও সত্যকে গোপন করা হল কারণ তা ছোটোদের উপযোগী বলে মনে করলেন না সাহিত্যিকরা। পাঁচ জন স্বামীর সঙ্গে সংসার করার জন্যে কিছু নিয়ম মান্য করতেন সকলেই। যেমন, একজন পাণ্ডব যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে থাকবেন তখন অন্য পাণ্ডবরা ঘরে প্রবেশ করবেন না। অর্থাৎ তাদের সেই ব্যক্তিগত জায়গাটা দেবেন। কিন্তু একবার অর্জুন এই নিয়ম অমান্য করতে বাধ্য হলেন এক বামুনকে সাহায্য করার জন্য। যার ফলে তাঁর বনবাস হল বারো বছরের জন্যে। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের যুধিষ্ঠির বলছেন, দ্রৌপদী আর সে যখন ঘরে বসে গল্প করছিল সেই গল্প অর্জুন শুনে নেওয়ার জন্য তার শাস্তি হয়।[১১] আসলে অন্যের গল্প করা শুনে নেওয়ার শাস্তি যে বারো বছরের বনবাস হতে পারে। সেটা ছোটো বড়ো সবার কাছেই বেশ আশ্চর্যের! অথচ তাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করলেন লেখকরা।

অর্জুন নর্তকীর বেশ বেছে নিলেন অজ্ঞাতবাস চলাকালীন। ভারতের শ্রেষ্ঠতম ধনুর্বীর নর্তকীর বেশ ধারণ করবেন এই কথার মধ্যে গৌরব নেই। তাই এ-প্রসঙ্গও তারা খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও এড়িয়ে গেলেন। খগেন্দ্রনাথ লিখছেন, অর্জুনের নাম হল বৃহন্নলা, সে নাচ-গান শেখাবার ভার নিলেন। অম্বা থেকে শিখণ্ডী হওয়ার মতোই অর্জুনের বৃহন্নলা হওয়ার প্রসঙ্গটাও সযত্নে এড়িয়ে গেলেন ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা।

তিন। মহাভারতের নিম্নবর্গের মানুষ : মহাভারত রাজবংশের কাহিনি হলেও রাজ পরিবারের মানুষ নয় এমন অনেক মানুষদের ভূমিকা এখানে অপরিহার্য। এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে মূল মহাভারতে অনেক সময়েই ন্যায় বিচার হয়নি। ছোটোদের মহাভারতে শুধু না, মূল মহাভারতেও তাঁদের যোগ্য সম্মান তাঁরা পায়নি। যেমন, কর্ণ চরিত্রটি মহাভারত জুড়েই অপমানিত। সারথির ছেলে অধিরথ অর্থাৎ কর্ণ অর্জুনের সমান বীর হলেও তাকে যুবরাজদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের সময় তার বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এমনকী দ্রৌপদী স্বয়ংবর এর সময়েও কর্ণকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে রাজি না হওয়ার কারণ হিসেবে বলেন তার জন্ম নীচু বংশে। ছোটোদের মহাভারতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয় না। প্রথমে বলা হয় আসলে তিনি ছিলেন যুধিষ্ঠিরের বড়ো ভাই। কর্ণের আসল পরিচয় সকলের সামনে এল তখনই যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন, কর্ণের নামে তর্পণ করতে। কারণ সে তাঁর বড়ো ছেলে—অর্থাৎ পাণ্ডবদের সহোদর ভাই। শুনে যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বললেন এই নিষ্ঠুরতা কেন কুন্তী করলেন। কর্ণের জন্য এই ক্ষোভটুকু ছাড়া তার জন্মের বৃত্তান্ত আর কিছুই বলা হল না। কর্ণের বিচার কখনো তার দক্ষতার মানদণ্ডে হল না। এমনকী 'দাতাকর্ণ' পালা হিসেবে প্রচলিত হলেও। কর্ণের যে মহৎ গুণ ছিল, সেই দানশীলতার উল্লেখ প্রায় কোনো মহাভারতেই করা হল না।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যায় মহাভারতে। গুরুর আদেশ পালন করা যেখানে প্রধান কর্তব্য। এমনই কয়েকটা উদাহরণ উঠে আসে ছোটোদের মহাভারতেও। যেমন, উদ্দালক ও আরুণি শিষ্য হিসেবে নিজের জীবন বিপন্ন করে গুরুর আদেশ পালন করেছে। ঠিক একইভাবে নিষাধ পুত্র একলব্য ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে যখন তা অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন অর্জুনের অনুরোধেই দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণায় চেয়ে বসেন তার বুড়ো আঙুল। যে আঙুল ছাড়া ধনুর্বাণ চালানো অসম্ভব। স্বশিক্ষিত একলব্যের থেকে গুরুদক্ষিণার এই অধিকার দ্রোণাচার্যের কি ছিল? ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা একলব্য প্রসঙ্গ এনেছেন গুরুভক্তির উদাহরণ হিসেবে। কিন্তু একলব্যের প্রতি হওয়া অবিচারের প্রসঙ্গে তাঁরা রয়ে গেছেন প্রশ্নহীন।

কিছু ক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যেই হিংসা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রয়েছে সিংহাসনের জন্যে ভ্রাতৃহত্যা। এই হিংসা দুই ভাইয়ের মধ্যে, ক্ষমতাবানের ক্ষমতাহীনের প্রতি, দেবতার সঙ্গে অসুরের। ছোটোবেলা থেকে হিংসা, নৃশংসতা, যুদ্ধ, হত্যার বিপরীত পাঠ পড়ানো হয়। কিন্তু সারা মহাভারত জুড়ে হিংসার উদ্‌যাপন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যোগ-এ ভরসা দিয়ে বলেছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ..."। যার অর্থ—তুমি কাপুরুষ হয়ো না, হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ কর। ওঠ, যুদ্ধ কর। মহাভারতকে দুটো অংশে ভাগ করলে তার প্রথম এবং প্রধান অংশ হবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধ বাদে বাকি অংশ অপেক্ষায় ক্ষীণকায়। এছাড়াও মহাভারতে সংঘটিত হয়েছে অনেক ছোটো-বড়ো যুদ্ধ এবং হত্যা। যুদ্ধের বিপরীতে শান্তির কথাই যেখানে ছোটো থেকে শেখানো হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধগুলোকে কীভাবে মান্যতা দেওয়া হবে? এদিকে, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যে মহাকাব্যে অনিবার্য! শিশু-কিশোর সাহিত্যিক মাত্রেই যুদ্ধকে নিরীহ করে তার ভয়াবহতা কমিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। ফলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধের বিশাল ভয়াবহতা থাকছে না ছোটোদের মহাভারতে।

চার। যুদ্ধ, নীতি ও দর্শনের টানা-পোড়েন : এই বিশালাকার মহাকাব্যটির কিছু কাহিনি নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বা নীতিশিক্ষার পাঠ দেওয়ায় প্রযোজ্য হলেও এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে মহাভারত উল্লেখিত নৈতিক শিক্ষা মহাভারতের আদর্শবান চরিত্রদের ক্রিয়াকলাপকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ভালো এবং মন্দের যে ভাগ আমরা দেখে এসেছি সেই ভাগকেই প্রশ্ন করেছে। যেমন, অন্য পাণ্ডবরা বীর এবং নীতিবান হলেও যুধিষ্ঠিরের যে গুণটার জন্যেই তাকে নিয়ে প্রবাদ প্রচলিত, তা হল তার সত্যবাদী চরিত্র। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলতেন না। কিন্তু গুরু দ্রোণাচার্যকে মারার জন্য তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। এই স্খলনকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হল না।

ছোটোদের মহাভারত লিখতে বসে গীতার প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়ত, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলাকালীন অর্জুনের স্বজনদের সঙ্গে লড়াই করার আগের যে মানসিক টানা-পোড়েন অনেক ক্ষেত্রেই বলা হল না। ছোটোদের জন্যে লেখা *মহাভারত* বইতে গীতার প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি।[১২] বাংলায় আলাদা করে গীতার অনেক অনুবাদ হয়েছে। ছোটোদের মহাভারত লেখার সময় গীতার প্রসঙ্গ আসলেও তা খুব সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলছেন, অর্জুন যুদ্ধের সময় যখন ধনুক ফেলে কাঁদতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন নানা উপদেশ দিয়ে তাঁর মনে বল সঞ্চার করতে লাগলেন। এই উপদেশ গীতা। এই উপদেশ শুনেই অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় যখন অর্জুন বলে, আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, রাজত্বের দরকার নেই। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে উৎসাহ দিলেন। তাতে অর্জুনের মন পরিবর্তন হল, শরীরে শক্তিও ফিরে এল। শ্রীকৃষ্ণের এই সব উপদেশের কথা নিয়েই ভগবদ্‌গীতা রচিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি বাক্যে গীতাকে বলে দেওয়া হল গীতার উদ্দেশ্য, বক্তব্য এবং ফলাফল।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বকের সংলাপ মহাভারতের অন্যতম দার্শনিক পটভূমি রচনা করে। এই সংলাপের পূর্বে নকুল এক হরিণের পেছনে ছুটে তাকে ধরার জন্য হাঁপিয়ে উঠে যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল, তখন সরোবরে জল খেতে গেলে অদৃশ্য একটি কণ্ঠ বলে উঠল তার সরোবরের জল খেতে হলে আগে তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। নকুল তা না মেনে জল খাওয়ায় মাটিতে সে লুটিয়ে পড়ল, এইভাবে পর পর এলেন সহদেব, ভীম ও অর্জুন। সকলেই প্রাণ হারালে যুধিষ্ঠির এসে দেখলেন সরোবরের পাশে তার চার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে। এদিকে কারোর দেহে অস্ত্রের কোনো আঘাত মাত্র নেই। তখন যুধিষ্ঠির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন বক যক্ষের রূপ ধারণ করে তাকে প্রশ্ন করছেন। যুধিষ্ঠির তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এবং সেই সব প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে যক্ষ এক ভাইয়ের প্রাণ ফেরতে দিতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুন বা ভীমের প্রাণ না-বাঁচিয়ে কেন নকুলের প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন? তখন যুধিষ্ঠির জানালেন তার আর এক মা মাদ্রীর দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তানকে প্রাণে বাঁচানো তার কর্তব্য। তখন যক্ষরূপী ধর্মের আশীর্বাদে সকলের প্রাণ ফিরে এল। এইটা ছিল ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ধর্মের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো করে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মজ্ঞ প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার বলছেন, "তখন সেই বক যক্ষের আকার ধারণ করিয়া এমন কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যেন যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সেগুলির সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।"[১৩] ফলে এভাবেই মহাভারতের দার্শনিক পটভূমি ছোটোদের মহাভারতে অধরাই থেকে গেল।

যে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শিশু-কিশোরপাঠ্য মহাভারত লেখা শুরু হয়েছিল বিশ শতকে তা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে শৈশব আর কৈশোরের ধারণা, বয়সের বিভাজন, মনোবিজ্ঞান, শিশুপালন পদ্ধতি ও তাদের পাঠক্রম। কিন্তু যেটা বদলায়নি তা হল ভালো এবং মন্দ বিভাজনের নিরিখে শিশুসাহিত্যের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নির্মাণ। উনিশ শতকে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সূচনা পর্বেই তার মূল নির্ধারিত হয়ে গেছিল গোপাল এবং রাখালদের বৈপরীত্য বিভাজনে।[১৪] বিশ শতক জুড়ে নানান সংরূপে লেখা মহাভারতে সেই গোপাল এবং রাখালদেরই ছাঁচেই পাণ্ডব এবং কৌরবদের বসিয়ে নিলেন ছোটোদের মহাভারতের লেখকরা। ভালোর দল মানে পাণ্ডবপক্ষ, তারা যা যা করবে সবই ভালো। ফলে শিশু-কিশোর সাহিত্য হয়ে উঠল শিশু-কিশোর শিক্ষার পরিপূরক।

এই ভালো আর মন্দের বাক্সতে আঁটছে না এমন সব বিষয়, যেগুলো প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে পাঠককে, সেই ঘটনা চরিত্র ও সিদ্ধান্তগুলোকে শিশু-কিশোর সাহিত্যে যথাসাধ্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাই বলা যেতে পারে আকারগত সংক্ষিপ্তকরণ এবং একধাপ এগিয়ে উপাদানগত সরলীকরণ পদ্ধতিকে প্রধান হাতিয়ার করেই সাহিত্যিকরা তথাকথিত বড়োদের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন ছোটোদের মহাভারতে। গদ্যে পদ্যে নাটকে মহাভারতের কোন কোন অংশগুলো তাঁরা রাখছেন আর আর কোনগুলো বাদ দিচ্ছেন তা নির্বাচনে তাঁদের একটি ব্যক্তিগত ছাঁকনি সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকছে। লেখকের শিক্ষা, ধর্ম-বিশ্বাস, পেশা, সামাজিক রাজনৈতিক সংযোগ শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করছে ছোটোদের কাছে ‘অপাঠ্য’ ও ‘অশিক্ষণীয়’-র সংজ্ঞা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের মহাভারতের বর্জন সংক্ষিপ্তকরণের এই খেলায় গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি বা তার অংশবিশেষ বাদ দেওয়া হচ্ছে বা খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। ফলে মূল মহাভারতের আখ্যানভাগের পরিবর্তন না হলেও কার্য-কারণ সূত্র এবং ঘটনাগুলির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল ঘটনাকে আড়াল করার জন্যে সত্যকে কিছুটা বিকৃত করেও পরিবেশন করা হয়েছে যেমন বস্ত্রহরণ, ঊরু প্রদর্শন ইত্যাদি। ফলে ঘটনা এবং তার ফলাফলের মধ্যে যুক্তির সম্পর্ক সব ক্ষেত্রে বজায় থাকছে না। ছোটোদের মন হলেও তারও একটা নিজস্ব যুক্তিকাঠামো আছে। কিন্তু মহাভারতকে ছোটো ও শিশু-কিশোরসেব্য করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে ঘটনার গুরুত্ব এবং তার ফলাফলের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

তবে ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে মহাভারতকে যেভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা সংক্ষিপ্ত বা সরল করে উপস্থাপন করেছেন সেই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। মহাভারতকে ছোটো করে লেখার আগে তাঁদের যে ভাবনা-পরিকাঠামো তাঁরা মনে মনে নির্মাণ করেছেন তা মহাভারত পাঠকে অনেক সহজতর করেছে। তবে সরলীকরণের দু-টি অভিমুখ আছে— এক, যেহেতু বড়োদের বিষয় বাদ দিয়ে মহাভারতের সঠিক অর্থ বোঝা সম্ভব না তাই মহাভারতকে সরল সহজ করতে গিয়ে তাঁরা মহাভারতের যে বহুমাত্রিকতা, যে দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধ অর্থাৎ প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোই শিশু-কিশোর পাঠকের কাছে প্রায় পৌঁছে দিতে পারছেন না। বাকিটা লেখকরা ছেড়ে রাখছেন ‘বড়ো হলে পড়বে’ এই শব্দ তিনটির ভরসায়। তাই এই বইগুলো ছোটোদের মনে মহাভারতের কাহিনির আভাস দিচ্ছে মাত্র, মহাভারতের সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ পাঠ হচ্ছে না। দুই, ছোটোদের জন্যে মহাভারত লেখার সময়ও তাকে কখনোই শুধু মহাকাব্য বলে দেখা হচ্ছে না, বরং তাকে বার বার ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যে ধর্ম শুধু মহাভারতে উল্লেখিত ধর্ম না, হিন্দু ধর্ম। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম একাকার হয়ে যাচ্ছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছোটোবেলা থেকে মহাভারতের এই পাঠ ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের আলাদা সচেতনতা নিয়েই তা ছোটোদের মনে প্রবেশ করানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও ছোটোদের মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা সময়ের দাবী মেনে লিখছেন এবং ছোটারা তা পাঠ্য হিসেবে পড়ছে। ভারতের মতন বহুধর্মের দেশে শিশু-কিশোর শিক্ষায় এবং সাহিত্যে হিন্দু ধর্মের আধিপত্যের একটা চোরা স্রোত বয়ে যাওয়ার নেপথ্যে ছোটোদের মহাভারত খুব ছোটো হলেও অংশগ্রহণ করছে। এখানেই আর ছোটোদের মহাভারত শুধু ‘ছোটোদের’ বিষয় থাকছে না হয়ে উঠছে ‘বড়ো’-দের একটি সুচিন্তিত প্রকল্প।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড সংস্করণ, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, বইমেলা ২০০০, পৃ. ৪৫৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 101
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 804 - 811
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৯, ভূমিকা
৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, প্রথম প্রকাশ, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ. ৩
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কুরুপাণ্ডব*, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৪
৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_majority
৬. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, সাহিত্যলোক সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বইমেলা ২০০২, পৃ. ৫৫
৭. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র প্রথম খন্ড*, লালমাটি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৮০
৮. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, সাহিত্যলোক সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বইমেলা ২০০২, পৃ. ৫৫
৯. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ. ৬৭
১০. ঘোষ, নির্মাল্য কুমার, *বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য পাঠের ভূমিকা*, ছোঁয়া, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৮৫
১১. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বইমেলা ২০০২, পৃ. ২২-২৩
১২. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *মহাভারত*, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮-২৯, যুদ্ধের খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন এবং গীতার প্রসঙ্গ পুরোটাই বর্জন করলেন।
১৩. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ৬৪
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।